৬.৮ রাজ্য পরিকল্পনা

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ১৯৬৭ সালের তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে রাজ্য পর্যায়ের পরিকল্পনা গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেছিল। রাজ্য পর্যায়ে পরিকল্পনার বিষয়টি সাধারণত তদারকি করে রাজ্য পর্যায়ের পরিকল্পনা মন্ত্রক। বহু রাজ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রকটি মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকে। কোনো কোনো রাজ্যে এই মন্ত্রকটির দায়িত্ব পৃথক-ভাবে কোনো মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকে। রাজ্য পর্যায়ের পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এবং তার ভিত্তিতে কী ধরনের পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজ্যে নেওয়া উচিত তা দেখাশোনা করে থাকেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ৭০-এর দশকে বিভিন্ন রাজ্য, রাজ্য পর্যায়ের বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য State Planning Board-এর কথা ভাবা হয়েছিল। অধিকাংশ রাজ্যই বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের বোর্ড গঠন করে থাকলেও বোর্ডগুলি হয় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি অথবা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অধিকাংশ রাজ্যে রাজ্য পরিকল্পনার সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে থাকে পরিকল্পনা মন্ত্রক।

রাজ্য পরিকল্পনা মন্ত্রক পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেই কাজ করে। রাজ্যের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের সঙ্গেও সমন্বয় রক্ষা করেই রাজ্য পরিকল্পনা দপ্তরকে কাজ করতে হয়। ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য পরিকল্পনা মন্ত্রককে আরো দক্ষ ও কার্যকরী করার জন্য কয়েকটি বিশেষ বিভাগ স্থাপনের সুপারিশ করে—

১. দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত পরিকল্পনা একক ;
২. পরিকল্পনা রূপায়ণ এবং মূল্যায়ন একক ;
৩. প্রকল্প মূল্যায়ন একক ;
৪. আঞ্চলিক জেলা পরিকল্পনা একক ;
৫. পরিকল্পনা সমন্বয় একক ;
৬. মানবসম্পদ এবং নিয়োগসংক্রান্ত একক।

৬.৮.১ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ

প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যস্তরের পরিকল্পনার জন্য রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজ্য সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এই পর্ষদ খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করে থাকে। রাজ্যে প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যায়ন এবং সম্পদের কার্যকরী ও যথার্থ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের কার্য নির্দেশের দায়িত্ব পর্ষদের। পর্ষদ রাজ্যের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করবে বলে প্রত্যাশিত। রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ জেলা স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণেও

সক্রিয় অংশ নেয় এবং জেলা পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে রাজ্য পরিকল্পনার সমন্বয় রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়োগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা এবং তার দূরীকরণের চেষ্টা করতে পর্ষদ উদ্যোগ নেবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। পরিকল্পনা প্রয়োগের পরে মূল্যায়ন ও কাজের অগ্রগতির প্রতি খেয়াল রাখা পর্ষদের দায়িত্ব। প্রয়োজন বোধ করলে পর্ষদ নীতিগত বা পদ্ধতিগত অবস্থানে পরিবর্তনের সুপারিশও করতে পারে। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের এহেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা বললেও অধিকাংশ রাজ্যেই পর্ষদ স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে বিকশিতই হয়নি। রাজনৈতিক টানাপোড়েন পর্ষদকে আরো অকার্যকরী করে তুলেছে।

৬.৮.২ জেলা পরিকল্পনা

১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশন-এর সহযোগী একটি কর্মগোষ্ঠী জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। C. H. Hanumantha Rao-এর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীটি জেলাকে পরিকল্পনার একক হিসেবে গ্রহণ করার সুপারিশ করে এবং জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ভারতের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব বলে মন্তব্য করে। কিন্তু এই কর্মগোষ্ঠীটি তাদের প্রতিবেদনটি পেশ করে গঠন হবার প্রায় ১৮ বছর পরে, ১৯৮২ সালে, ফলে বহু তথ্য সংক্রান্ত পরিবর্তন এই সময়ের মধ্যে ঘটে যায়। ১৯৮২ সালে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা ভারতে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি।

স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলার জন্য এবং তৃণমূলস্তরে পরিকল্পিত উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করার জন্য জেলাস্তরে পরিকল্পনা এককের কথা ভাবা হয়। স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নকে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে হলে জেলার মাধ্যমেই পরিকল্পিত উন্নয়নের বার্তা প্রেরণ করতে হবে। রাজস্ব, ভূমি হিসাব, সেচ, আবাসন, রাস্তা, জনশিক্ষা, গণস্বাস্থ্য প্রভৃতি উদ্যোগগুলিকে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত সঞ্চারিত করতে হলে জেলা পরিকল্পনাকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ভাবা হয়। রাজ্য ও স্থানীয় উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য জেলা পরিকল্পনা এককের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়। স্থানীয় বস্তু সম্পদ ও মানব সম্পদের সমন্বয় যথার্থভাবে জেলাস্তরেই ঘটতে পারে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টায় জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে সাফল্যের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে জেলা পরিকল্পনা।

C. H. Honumantha Rao কমিটি রাজ্যে জেলা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য যে সুসংহত এলাকা পরিকল্পনা, সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা, সংগঠন, বর্ধিত দায়িত্ব ও

ভূমিকা, সম্পদ পরিচালন প্রভৃতির সুপারিশ করেছিল তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েনি। এই কমিটি মানবসম্পদ পরিকল্পনা ও পরিচালনের ওপর জোর দেয়। এছাড়া জেলা কালেক্টরের অধীনে সম্পূর্ণ জেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণের সুপারিশ করে। এই কমিটির মতে, তিনটি পর্যায়ে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা যেতে পারে—

১. **পরিকল্পনা সূচনা পর্ব**, যেখানে মূলত জেলা পরিকল্পনার পরিধি ও ক্ষেত্র নির্ণয় করা হবে, সম্পদ সংগ্রহের কথা ভাবা হবে, জেলাগুলিকে কী ভিত্তিতে পরিকল্পনা খাতের অর্থ প্রদান করা হবে তা নির্ণয় করা হবে, জেলাস্তরে পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমকে শক্তিশালী করা হবে, জেলাস্তরে অনুভূমিক তদারকি এবং উল্লম্বস্তরে ঊর্ধ্বতনের দ্বারা তদারকির ব্যবস্থা হবে, জনপ্রতিনিধিত্ব সহ জেলা পরিকল্পনা পর্ষদ বা কমিটি গঠন করা হবে, পঞ্চবার্ষিকী ও বাৎসরিক পরিকল্পানার জন্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়া নির্ধারিত হবে।

২. দ্বিতীয় পর্যদের সীমিত বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুযায়ী সীমিত কিছু ক্ষেত্রকে জেলা পরিকল্পনা এক্তিয়ারভুক্ত করা হবে। জেলা পরিকল্পনাকে স্থানীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রাখার জন্য এই পর্যায়ে ভাবনা করা হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পদ আনয়ন, জেলাস্তরে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ প্রভৃতির ওপর এই পর্যায়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৩. তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণের ওপরে জোর দেওয়া হবে বলে মনে করা হয়। প্রশাসনিক সংস্কার, উচ্চপর্যায়ের জনপ্রতিনিধিত্ব, বাজেটে স্থানীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি, জেলা উন্নয়ন বিভাগগুলিকে জেলা পরিকল্পনা পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ করা, জেলাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিকল্পনা তৈরি, জেলাস্তরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে জেলা পরিকল্পনাকে এই পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়।

এইরূপ সুচিন্তিত সুপারিশও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জেলা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হন। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে প্রথমবার, ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় দ্বিতীয়বার এবং ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে তৃতীয়বার, জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিল কেন্দ্রীয় সংসদে পেশ করা হয়। কিন্তু কোনোবারই বিলটা আইনে রূপান্তরিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে নরসিমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনী গ্রহণের সময়ে যখন বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন

সংবিধানের ২৪৩ (জেড-ডি) এবং ২৪৮ (জেড-ই) ধারা দুটি প্রবর্তন করে যথাক্রমে গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে জেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াকেও বিকেন্দ্রীকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছিল [২৪৩ (জেড-ডি)]। পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা চলে আসছিল, তা জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের পরও তেমনভাবে বিকেন্দ্রীকৃত করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কমিটি রাজ্য পরিকল্পনার সুপারিশ করলেও ৭০-এর দশকে যেসব রাজ্যে রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়েছিল, সেগুলিও তেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। অধিকাংশ রাজ্যে ৯০-এর দশকে এ ধরনের কোনো বোর্ডের অস্তিত্ব ছিল না। এর প্রেক্ষাপটে জেলা পরিকল্পনাকে সংবিধানের মধ্যে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল সমগ্র ভারতীয় আর্থিক উন্নয়নের ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করা।

এই ধারাটির মধ্য দিয়ে ভারতের পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেলাকে সর্বনিম্ন একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রত্যেক রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সঙ্গে এই কমিটিকে যোগাযোগ রাখতে বলা হয় এবং পঞ্চায়েতের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে যাতে জেলা পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব হয়, সেদিকে এই কমিটিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়।

এই কমিটির সদস্য সংখ্যা কত হবে সে বিষয়ে সংবিধানে নির্দিষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। সংবিধানে বলা আছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জেলা পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা এবং তাদের গঠন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে। বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভাগুলি এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আইন পাশ করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট জেলার জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সেই জেলার পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার আইনগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ বিধানসভাই জেলা উন্নয়ন বোর্ডের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটিতে জেলা পরিকল্পনা বোর্ডের মোট সদস্যের তিনভাগ যাতে নির্বাচিত সদস্য হন, সে বিষয়ে অধিকাংশ রাজ্যে বিধানসভার আইন ঐকমত্যে পৌঁছেছে। জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে জেলা পরিকল্পনা বোর্ডের এই সদস্যরা নির্বাচিত হবেন এবং এক্ষেত্রে নির্বাচক-মণ্ডলী হিসেবে থাকবেন জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। বাকি এক ভাগ সদস্য কারা হবেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভা বিভিন্ন আইন গ্রহণ করেছে। কোনো কোনো রাজ্য জেলা এবং ব্লক পর্যায়ের প্রতিনিধিকে বোর্ডের অবশিষ্ট সদস্য

হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছে। রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রকের আধিকারিকদের বোর্ডের অবশিষ্ট সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছে।

জেলা পরিকল্পনা বোর্ড সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতি প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল যদি কোনো নির্দেশনামায় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা উল্লেখ করে থাকেন, তবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বাধ্য থাকবেন জেলা পরিকল্পনা বোর্ড। যে খসড়া পরিকল্পনাটি পরিকল্পনা বোর্ড গঠন করবে সেটির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বোর্ডের নেই। সেই খসড়া পরিকল্পনাটিকে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানি বোর্ড তথা জেলা পরিকল্পনা বোর্ড এবং এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

৯০-এর দশকে জেলা পরিকল্পনার সূচনা ঘটলেও মনে রাখা দরকার যে, মোটামুটি একই সময়ে ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গৃহীত হয়। এই উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়নের (এল.পি.জি.)* প্রভাবে পরিকল্পনা মাফিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি ভারতে তার আগেকার গুরুত্ব কিছুটা হারিয়েছে। যেভাবে পরিকল্পনা কমিশন-এর মাধ্যমে গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি প্রচলিত ছিল, তাতে উদারীকরণের প্রক্রিয়ায় কিছুটা আঘাত হানে। স্বভাবতই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বোর্ড কতটা কার্যকরী হয়ে উঠবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়, বিশেষত যখন পরিকল্পনা কমিশন-এর ভূমিকা নিয়েই বিশেষজ্ঞ মহলে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠছে।